বিশেষ ক্রোড়পত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা
১৮ অগ্রহায়ণ ১৪২৪
২ ডিসেম্বর ২০১৭

বাণী

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় পার্বত্য শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের দুই দশক পূর্তি উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করেছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি এ উপলক্ষে পার্বত্য এলাকায় বসবাসরত সকল অধিবাসীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

বাংলাদেশের তিন পার্বত্য জেলা খাগড়াছড়ি, বান্দরবান এবং রাঙ্গামাটি নৈসর্গিক সৌন্দর্যের অপার আধার। যুগযুগ ধরে পাহাড়ে বসবাসরত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বর্ণিল জীবনাচার, ভাষা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি এ অঞ্চলকে বিশেষভাবে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করেছে। পার্বত্য জেলাগুলোর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আন্তরিক উদ্যোগে সরকার কর্তৃক গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে এক ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এর ফলে পার্বত্য জেলাসমূহে দীর্ঘদিনের সংঘাতের অবসান ঘটে। সূচিত হয় শান্তির পথচলা। শান্তিপূর্ণভাবে বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে সারাবিশ্বের জন্য এটি একটি অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত।

শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় গঠিত হয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ। আমি বিশ্বাস করি শান্তি চুক্তির মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের মানুষের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে। পার্বত্য জেলাসমূহের উন্নয়ন সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে এবং প্রিয় মাতৃভূমির উন্নয়নে আমি দলমত নির্বিশেষে সকলকে একযোগে কাজ করার আহবান জানাই। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন, সকলের মিলিত প্রচেষ্টায় তা বাস্তবায়ন সম্ভব বলে আমি মনে করি।

পার্বত্য শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের দুই দশক পূর্তিতে আমি পার্বত্য এলাকার উন্নয়ন সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে সকলকে ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস চালানোর আহ্বান জানাচ্ছি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির দুই দশক

রমা রাণী রায়

২ ডিসেম্বর ১৯৯৭ সাল। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের লীলাভূমি পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রায় দুই যুগ ধরে চলমান সশস্ত্র ও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের অবসানে একটি ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সূচনা হয় পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি ও উন্নয়নের নবযাত্রা। পার্বত্যাঞ্চলের সকল নাগরিকের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতার প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি' এবং 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি'র মধ্যে এই ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যা দেশে এবং আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি' নামে পরিচিত এবং সমাদৃত।

পার্বত্যাঞ্চলের দীর্ঘ দিনের চলমান সংঘাতকে রাজনৈতিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে রাজনৈতিকভাবে সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা এবং দুরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বে জাতীয় সংসদের চীফ হুইপ জনাব আবুল হাসনাত আবদুল্লাকে প্রধান করে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিরাজমান সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি' গঠন করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব নিয়ে উক্ত কমিটি সশস্ত্র আন্দোলনরত 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি'র সাথে তাদের দাবী দাওয়া বিষয়ে দ্বিপাক্ষিক অনেকগুলি বৈঠক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কোন তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতা ছাড়াই সমঝোতায় উপনীত হতে সমর্থ হয়। এরই ফসল হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ফলশ্রুতিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের দীর্ঘ প্রায় দুই যুগের সংঘাতের অবসান ঘটে এবং তামাটে পাহাড়ের গায়ে সবুজ তরুলতা ও গাছপালার অঙ্কুরোদগম হয়। পাহাড় থেকে পাহাড়ে বয়ে যায় শান্তির সুবাতাস এবং সহজ-সরল পাহাড়ী মানুষের মনে জেগে উঠে শান্তি ও স্বস্তির আশ্বাস । দীর্ঘ দিনের গোলা বারুদের গন্ধমুক্ত বাতাসে পার্বত্যবাসীর নিঃশ্বাস নেয়ার সুযোগ সৃষ্টিকারী এই চুক্তিটি পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি নামে বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় স্থান দখল করেছে । আন্তর্জাতিক পর্যায়েও চুক্তিটি বিপুল প্রশংসা কুড়িয়েছে।

পার্বত্য শান্তি চুক্তির অর্জন

- পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সৃষ্টি
- তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ শক্তিশালীকরণ
- পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন গঠন
- শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, পর্যটন, সমবায়, মৎস্য, সমাজ কল্যাণসহ ৩০টি বিভাগ/বিষয় ৩ পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তর
- নতুন রাস্তা ও ব্রীজ নির্মাণের মাধ্যমে প্রত্যন্ত এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন
- সার্কেল চীফ/ হেডম্যান/ কার্বারীদের ভাতা বৃদ্ধি
- ঢাকার বেইলী রোডে পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স নির্মাণ
- তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে প্রতি বছর শিক্ষা-বৃত্তি প্রদান
- কৃষকদের উন্নয়নে মিশ্র ফলের বাগান সৃজন
- পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ গঠন
- ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ সংক্রান্ত টাস্কফোর্স গঠন
- রাংগামাটি মেডিকেল কলেজ এবং রাংগামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা
- প্রত্যন্ত অঞ্চলে সৌর বিদ্যুৎ সুবিধা সম্প্রসারণ
- বিদ্যুতের সঞ্চালন লাইন সম্প্রসারণ ও সাবস্টেশন স্থাপন
- ৪০০০ পাড়া কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান
- ৪টি আবাসিক উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো নির্মাণ
- মোবাইল নেটওয়ার্ক চালু
- নিরাপদ পানি সরবরাহ সুবিধা বৃদ্ধি

চুক্তি স্বাক্ষরের পরবর্তী ধাপে ১৯৯৮ সালের ১০ ফেব্রুয়ারী খাগড়াছড়ি ষ্টেডিয়ামে এক আড়ম্বরপুর্ণ অনুষ্ঠানে জনসংহতি সমিতির সভাপতি জনাব জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে অস্ত্র সমর্পণ করে অশান্তি ও হানাহানির পথ ছেড়ে শান্তি, সম্প্রীতি এবং অগ্রগতির অভিযাত্রায় সামিল হ'ন।

শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে বিদ্যমান আইনসমূহ সংশোধন করে তিনটি জেলা পরিষদকে বহুলাংশে শক্তিশালী করা হয়েছে, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হয়েছে, ভারত প্রত্যাগত শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পুর্নবাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নিদিষ্টকরণ ও পুর্নবাসন সংক্রান্ত টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। ১৯৯৮ সালের ১৫ জুলাই সৃষ্টি করা হয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়। সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে থেকেই স্থানীয় পর্যায়ে জনপ্রতিনিধিত্বশীল প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষের জীবন যাত্রার মানোন্নয়নে এক নবযাত্রার শুভ সূচনা হয়েছে। উত্তপ্ত পাহাড়ের যে সকল পরিবার শরণার্থী হয়েছিল পার্শ্ববর্তী দেশে, তারা ফিরে আসে মাতৃভূমিতে, তাদের প্রয়োজনীয় এবং প্রতিশ্রুত সুযোগ সুবিধাসহ পুনর্বাসন করা হয়। পার্বত্যাঞ্চলের প্রধান সমস্যা ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য 'ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন' গঠিত হয়, পরবর্তীতে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ এর কতিপয় ধারা সংশোধনপূর্বক 'ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১' এর সংশোধনী বিল মহান জাতীয় সংসদে পাস করা হয়। শান্তি চুক্তির শর্তানুযায়ী চুক্তির ৭২টি ধারার মধ্যে ইতোমধ্যে ৪৮টি ধারা সম্পূর্ণ, ১৫টি ধারা আংশিক এবং অবশিষ্ট ৯টি ধারার বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান আছে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, ইতোমধ্যে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়াধীন ৩০টি বিভাগ/বিষয় রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদে এবং ২৮টি বিভাগ/বিষয় বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তরিত হয়েছে। বর্ণিত বিভাগ/বিষয়গুলো হস্তান্তরের মাধ্যমে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের কর্মপরিধি বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পার্বত্য মানুষের জন্য সেবা প্রাপ্তির স্থান নিকটবর্তী ও সহজলভ্য হয়েছে। তিন পার্বত্য জেলার উন্নয়ন কর্মকান্ড এবং প্রশাসনিক বিষয়াদি তদারকির দায়িত্ব রয়েছে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদে'র উপর। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিক প্রচেষ্টা, পার্বত্যবাসীর প্রতি উদার ও সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির কারণে পার্বত্য এলাকার শান্তি ও উন্নয়নের অভিযাত্রা বেগবান হয়েছে। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি পার্বত্য এলাকার শান্তির পরিবেশ আরো সুসংহত হবে এবং অদূর ভবিষ্যতে এ অঞ্চল হবে শান্তি ও উন্নয়নের রোল মডেল।

লেখক ঃ অতিরিক্ত সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১৮ অগ্রহায়ণ ১৪২৪
২ ডিসেম্বর ২০১৭

বাণী

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির দুই দশক পূর্তি উপলক্ষে আমি পার্বত্য জেলাসমূহের জনগণ ও দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানাই।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের দীর্ঘদিনের সংঘাতময় পরিস্থিতি নিরসনের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর কোন তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতা ছাড়াই আওয়ামী লীগ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে এই ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বিশ্ব ইতিহাসে এটি একটি বিরল ঘটনা।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সর্বপ্রথম আধুনিকতার ছোঁয়া বিবর্জিত পশ্চাদপদ পার্বত্য জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূলধারায় ফিরিয়ে আনেন। তাদের মানোন্নয়নে নানামুখী কর্মসূচি গ্রহণ করেন। আঞ্চলিক উন্নয়নের পাশাপাশি শিক্ষাক্ষেত্রে পাহাড়ী ছাত্র-ছাত্রীদের সম-সুযোগ প্রদানের ব্যবস্থা নেন। এ লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সালের জুন মাসে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও কারিগরি প্রতিষ্ঠানসমূহে পাহাড়ী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সুনির্দিষ্ট আসন সংরক্ষণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

'৭৫-পরবর্তী অগণতান্ত্রিক সরকারগুলো পার্বত্য অঞ্চলের সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার পরিবর্তে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য বাঙালি-পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে। খুন, রাহাজানি, অত্যাচার-অবিচার, ভূমি জবরদখল এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপব্যবহার এ অঞ্চলকে আরও অস্থিতিশীল করে তোলে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের দীর্ঘদিনের জাতিগত হানাহানি বন্ধ হয়। অনগ্রসর ও অনুন্নত পার্বত্য অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শান্তি ও উন্নয়নের ধারা। ইউনেস্কো শান্তি পুরস্কার অর্জন এই চুক্তির আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির স্মারক।

আমাদের সরকার শান্তি চুক্তির আলোকে এ অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমরা পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ গঠন করেছি। এ অঞ্চলের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, যোগাযোগ, অবকাঠামো, মোবাইল নেটওয়ার্কসহ সকলখাতের উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। আমরা রাঙ্গামাটিতে একটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছি । ভূমি বিষয়ক বিরোধ নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বোর্ডের কার্যক্রম আরও গতিশীল ও সুসংগঠিত করার লক্ষ্যে আমাদের সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৪ প্রণয়ন করেছে। পার্বত্য জেলাসমূহের নৈসর্গিক সৌন্দর্য সমুন্নত রাখা ও পর্যটন শিল্পের প্রসারেও আমরা নানামুখী উদ্যোগ নিয়েছি। আমাদের সময়োচিত পদক্ষেপের ফলে আজ পার্বত্য জেলাসমূহ কোন পিছিয়ে পড়া জনপদ নয়। দেশের সার্বিক উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় এ অঞ্চলের জনগণ সম-অংশীদার।

বিএনপি-জামাত জোট সরকার ২০০১ সালে ক্ষমতায় এসে ঐতিহাসিক এই শান্তি চুক্তির চরম বিরোধিতা করে পার্বত্য অঞ্চলকে পুনরায় অস্থিতিশীল করতে চেয়েছিল। তাদের এ হীন উদ্দেশ্য সফল হয়নি। আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের সর্বত্র শান্তি বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর।

আমি আশা করি, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে আমরা জাতির পিতার সুখী-সমৃদ্ধ, শান্তিপূর্ণ স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সক্ষম হব।

পার্বত্য শান্তি চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়নে আমি সকলের সহযোগিতা কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু,
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

সংসদ উপনেতা
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ
ও
আহ্বায়ক
পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি

বাণী

ঐতিহাসিক পার্বত্য শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের দুই দশক পূর্তিতে আমি পার্বত্যবাসীকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

এই অঞ্চলকে নিয়ে বিভিন্ন গোষ্ঠী বিভিন্ন সময়ে তাদের নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করার প্রয়াস পেয়েছে। তারা সেখানে শান্তির পরিবর্তে অশান্তি, আলোচনার পরিবর্তে অস্ত্রের ঝনঝনানি আর সাম্প্রদায়িক সংঘাতকে উস্কে দিয়েছে বার বার। এমনি এক সংঘাতময় পরিস্থিতিতে ১৯৯৭ সালের ০২ ডিসেম্বর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার যোগ্য নেতৃত্বের ফলে স্বাক্ষরিত এ চুক্তি পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছে।

শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি পার্বত্য শান্তি চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে। বিগত বিএনপি-জামাত জোট সরকার ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নে অনাগ্রহ ও নিষ্ক্রিয়তার কারণে যে স্থবিরতা সৃষ্টি হয়েছিল, তা কাটিয়ে উঠে ইতোমধ্যেই চুক্তির সফল পূর্ণবাস্তবায়নে গতি ফিরে এসেছে।

নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক বিশেষ ঐতিহ্যমন্ডিত পার্বত্য অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ আন্তরিকভাবে কাজ করে চলেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষের সার্বিক মঙ্গল ও উন্নয়নে যুগান্তকারী এই চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়নে আমি সকলের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হউক।

সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী, এমপি

সভাপতি
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি।

বাণী

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির "দুই দশক" পূর্তি উপলক্ষে একটি বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত। ঐতিহাসিক এ চুক্তি স্বাক্ষরের সন্ধিক্ষণে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির পক্ষ থেকে আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের নাগরিকগণের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার সমুন্নত এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া তরান্বিত করাসহ তাদের অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে ২ ডিসেম্বর, ১৯৯৭ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এ ঐতিহাসিক পার্বত্য শান্তি চুক্তি সম্পন্ন হয়। জননেত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী রাজনৈতিক প্রজ্ঞার কারণেই পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে শান্তির সুবাতাস বইতে শুরু করে। এ শান্তি চুক্তির সুবাদে দীর্ঘ রাজনৈতিক হানাহানি আর সশস্ত্র সংগ্রামের পরিবর্তে স্থাপিত হয় পারস্পরিক আস্থা আর সহনশীলতা। বিগত জোট সরকারের সময় এ অঞ্চলে উন্নয়নের ক্ষেত্রে তেমন কোন অগ্রগতি হয়নি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০১৬ (সংশোধন)সহ পার্বত্য শান্তি চুক্তির অধিকাংশ শর্তই ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে এবং বাকিগুলো বাস্তবায়নের পথে।

আশা করছি ভবিষ্যতে এ উন্নয়ন অগ্রযাত্রা আরও দ্রুততার সাথে এগিয়ে যাবে। পার্বত্য অঞ্চলের নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মতই এ-অঞ্চলটি সমৃদ্ধ রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যে ভরে উঠুক-এ প্রত্যাশা করছি।

আমি এ মহতী উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

জয় বাংলা,জয় বঙ্গবন্ধু।

র,আ,ম,উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী, এমপি

সচিব
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য সমৃদ্ধ বাংলাদেশের এক রূপময় ভূ-খন্ড পার্বত্য চট্টগ্রাম। ১৯৭৫ সনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্মম হত্যাকান্ডের পর দেশব্যাপী বিরাজমান অশান্ত পরিস্থিতিতে দেশের এক দশমাংশ এলাকা নিয়ে গঠিত অফুরন্ত সম্ভাবনাময় তিন পার্বত্য জেলায় শুরু হয় সংঘাত ও রক্তপাত যা দুই যুগেরও বেশী সময় ধরে অব্যাহত থাকে।

১৯৯৭ সনের ২ ডিসেম্বর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার আন্তরিক উদ্যোগে ও প্রচেষ্টায় তাঁর উপস্থিতিতে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি' ও 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি'র মধ্যে এক ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে দুই দশকের বেশী সময় ধরে চলমান রক্তক্ষয়ী সংঘাতের অবসানে পার্বত্য জনপদে ফিরে আসে শান্তি ও স্বস্তি। চুক্তির ফলশ্রুতিতে গঠিত হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, পুনর্গঠিত হয় তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ । বাংলাদেশ সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীদের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় নেয়া হয় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচী। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে এই অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের জীবনে ইতোমধ্যে সূচিত হয়েছে দিন বদলের পালা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় শান্তি চুক্তির পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সম্প্রীতি ও উন্নয়নের মেলবন্ধন রচনা করে তিন পার্বত্য জেলার মানুষের উন্নয়ন ও কল্যাণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরের দুই দশক পূর্তিতে শান্তি ও উন্নয়নের অভিযাত্রা অব্যাহত থাকুক-এ কামনা করি।

নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি

প্রতিমন্ত্রী
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার যোগ্য ও দূরদর্শী নেতৃত্বে কোনো তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতা ছাড়াই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে পার্বত্য শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ঐতিহাসিক এ চুক্তির দুই দশক পূর্তিতে আমি পার্বত্যবাসীসহ দেশের শান্তিকামী সকল মানুষকে শুভেচ্ছা জানাই।

যুগান্তকারী এই চুক্তি স্বাক্ষরের পরই ১৯৯৮ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের মধ্য দিয়ে এর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী দীর্ঘদিন বিরাজমান ভূমি সমস্যা সমাধানে ভূমি কমিশন এবং ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পূর্নবাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুর্নবাসন বিষয়ক টাস্কফোর্স গঠনসহ পিছিয়ে থাকা পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য বহুমূখী কার্যক্রম শুরু হয় । বর্তমানে উন্নয়নের এ ধারা আরো গতিশীল ও সুদৃঢ় হয়েছে।

ভূমি বিরোধ সমস্যা হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামের মূল সমস্যা। এ সমস্যা সমাধানে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন-২০১৬ (সংশোধন) বিল মহান জাতীয় সংসদে পাস করা হয়েছে। পার্বত্য এলাকায় ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তিকল্পে ভূমি কমিশন পুরোদমে কাজ শুরু করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

তাছাড়া পার্বত্য এলাকায় স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিদ্যুৎ, ধর্মীয় তথা গ্রামীণ অবকাঠামো খাতে ব্যাপক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে। শান্তি চুক্তির সফল বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আর পারস্পরিক সহনশীলতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছে।

শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার দুই দশক পূর্তিতে আমি এ চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য সকলের ঐকান্তিক সহযোগিতা এবং ইতিবাচক ও গঠনমূলক ভূমিকা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বীর বাহাদুর উশৈসিং, এমপি